ভিয়েনায় বিক্রমপুরের পোলাপাইন

কাজী জহিরুল ইসলাম

ওয়েস্ট বনহফ স্টেশনে নেমে আমরা কিছুটা দিশেহারা। কসোভো ইউরোপ হলেও পূর্ব আর পশ্চিম ইউরোপ সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন জগৎ। তাছাড়া কসোভোর শাসনভার আমাদের তথা জাতিসংঘের হাতে। ওখানে আমাদেরকে ট্যাক্স দিতে হয় না, পার্কিং-এর জন্য পয়সা দিতে হয় না, সাহায্য প্রত্যাশা করে কারো দিকে তাকালেই দৌড়ে ছুটে আসে কয়েকজন একসাথে। এখানে সেই অবস্থা নেই। অস্ট্রিয়ানরা কথা বলে জার্মান ভাষায়, অনেকেই ইংরেজী বোঝে তবে বেশিরভাগই বোঝে না, বা বুঝতে চায় না। তাছাড়া সকলের মধ্যে কেমন একটা তাড়াহুড়া, যেন গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। একটা চক্করের মধ্যে পড়ে গেলাম।

আমরা চার বাঙালী ইউরোপ দেখতে এসেছি। বিনে পয়সার শাটল প্লেনে চড়েতো ভিয়েনা পর্যন্ত এলাম, এরপর? আমি সাথে করে একটি ম্যাপ নিয়ে এসেছি। বাসে যাবো না ট্রেনে যাবো? কোনটা সস্তা? প্রথমে কোথায় যাবো? তারপরে কোথায় যাবো? একে-ওকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করছি। তেমন কোন সুবিধা করতে পারছি না। আমাদের এতো লম্বা ফিরিস্তি শোনার সময় নেই কারো। ওয়েস্ট বনহফ স্টেশনের ফ্লোরে বিছানো শাদা মর্বেলের ওপর নিজেদের ব্যাগগুলো বিছিয়ে চর দখলের মতো এক টুকরো জায়গা দখল করে বসে পড়লাম। জুলাইয়ের বিকেল অনেক লম্বা, এখনো আকাশে দুপুরের সূর্য। ম্যাপের ওপর চার জোড়া চোখ হুমড়ি খেয়ে পড়ে। কিছুটা হোমওয়ার্ক আমি আগেই করে রেখেছি। ম্যাপের ওপর আঙুল রেখে বললাম, ভিয়েনা থেকে যাবো বার্লিন, ওখান থেকে ব্রাসেলস, তারপর প্যারিস। বার্লিনে আমরা একরাত থাকবো, জায়গা দিলে দাউদ হায়দারের বাসায় আর না দিলে হোটেলে। প্যারিসে থাকতে

হবে নিজের পয়সায়, দুই রাত। তারপর সোজা রোম। ওখানেও দুই রাত, রোম থেকে ইউরো রেলে চড়ে ইতালীর ব্রিন্ডিসি। ওখান থেকে জাহাজে চড়ে ভূমধ্যসাগরের নীল জল পেরিয়ে দ্যা গ্রেট সক্রেটিসের শহর এথেন্স। তারপর মহাবীর আলেক্সান্ডারের জন্মভূমি থেসালোনিকি হয়ে মেসিডোনিয়ার রাজধানী স্কোপিয়ে, এরপর ট্যাক্সি নিয়ে কসোভো। ঠিক আছে?

'খুবতো ফটফট কৈরা কৈলেন, খাড়ান আগে বুইজ্যা লই।' আনোয়ারুজ্জামানের কথায় অন্যরাও আরো একবার বোঝার চেষ্টা করছেন। আমি কিছুটা রিল্যাক্সড এবং কনফিডেন্ট। কারণ আমি জানি এর চেয়ে ভালো ধারণা আর কেউ দিতে পারবে না। ব্রিন্ডিসি পর্যন্ত ইউরো রেল, তারপর জাহাজ। কিছুদিন আগে ঠিক এইরকম একটি ট্রিপ করে গেছেন আমাদের আরো দুই সহকর্মী, জাহিদ হায়দার এবং রকিব মন্ডল। ওদের সঙ্গেও আমি কিছুটা আলাপ করে নিয়েছি। বোখারী বললো, 'এতো দেহা-দেহির কি আছে, জহির যা কৈছে ঐটাই সই। টিকেট পাওয়া যাইবো কৈ?' আমরা স্টেশনের দোতলায় উঠে যাই। এক উর্বশী অস্ট্রিয়ান তরুণী যন্ত্রের মতো কথা বলছে। হিশেব-নিকেশ করে জানালো, জন প্রতি সাত'শ আশি ডয়েশমার্ক। মানি চেঞ্জারের কাছ থেকে ডলার ভাঙিয়ে সবাই টিকেট কিনলাম। আমার পথ কিছুটা ভিন্ন। বার্লিন থেকে আমি আলাদা হয়ে যাবো।

রাত আটটায় ট্রেন, হাতে এখনো অনেক সময়। আনোয়ারুজ্জামানকে ব্যাগের পাহারায় রেখে আমরা তিনজন স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এলাম। চমৎকার ওয়েদার। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। পেটের ভেতর

ক্ষুধা চনমনিয়ে উঠছে। কাছেই একটি ফাস্ট-ফুডের দোকান পেলাম। লম্বা ব্রেডের ভেতর সসেজ ঢুকিয়ে ম্যাওয়ানিজ এবং লেটুশ পাতা দিয়ে হটডগ বানিয়ে দিলো। খাওয়ার পরে মনে হলো, শূয়োর না-তো? পয়সা বাঁচানোর জন্য বড় এক বোতল কোক কিনেছি। বোতলে মুখ লাগিয়ে পালা করে সিপ দিতে দিতে ভিয়েনার রাস্তায় হাঁটছি। ঝকঝকে পরিস্কার আকাশ। আমাদের দেশে গরমের দিনে বৃষ্টি হয় আর শীতকাল শুষ্ক, খটখটে। ইউরোপে ঠিক তার উল্টো, সামারে কোন ঝড়-বৃষ্টি নেই, ওইসব প্রাকৃতিক দূর্যোগ সব শীতকালের জন্য তুলে রাখা। কি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন শহর। রাস্তায় কোন ধুলা-বালি নেই, ময়লা আবর্জনা নেই। একই রাস্তায় ট্রাম, বাস সবই চলছে, স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক বাতির নিয়ন্ত্রনে সবকিছু কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। কারো সঙ্গে কারো ধাক্কা লাগছে না, আবার মনে হচ্ছে এই বুঝি ঠোকাঠুকি লেগে গেল। লাগতে লাগতেও লাগছে না। এতো ব্যাস্ত রাস্তা-ঘাট, সাঁই সাঁই করে গাড়ি ছুটছে। আবার হুশ করে বড় বড় বাসগুলো থেমে পড়ছে, সাথে সাথেই রেলপাত বিছানো একই রাস্তায় অন্যদিক থেকে একটি ট্রাম ছুটে আসছে। কয়েক সেকেন্ডের মাত্র ব্যাবধান। কিন্তু কোন অঘটন নেই। এই দেশটিকে একসময় বলা হতো ইউরোপের শ্বাশুড়ি। যখন ইউরোপীয়রা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিল, তখন ইউরোপের অনেকগুলো দেশের রাজাই ছিলেন অষ্ট্রিয়ার রাণীর জামাতা। হিটলারের মতো খলনায়কেরও জন্ম এই অষ্ট্রিয়ায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার দখল করে নেন এই দেশটি। ৮৪ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই দেশটিতে মাত্র ৮২ লক্ষ লোক বাস করে। জনসংখ্যা বাড়ে বছরে ০.০১ শতাংশ হারে। ৩২ হাজার ৯'শ ডলার মাথাপিছু আয়ের এই দেশটিতে মাত্র ৫ শতাংশ লোক বেকার। জনসংখ্যার ৯৮ শতাংশ শিক্ষিত এবং ৮০ শতাংশ খ্রীস্টান।

ভিয়েনার বিশাল একটি সুপারমার্কেটে ঢুকে আমরা কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছি না। এই দোকানে তেল, নুন, তরি-তরকারী থেকে শুরু করে গাড়ির পার্টস, বাড়ির আসবাবপত্রসহ সবই বিক্রি হয়। আমরা কিছুই কিনলাম না, খালি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। স্টেশনে ফেরার পথে দেখি হলুদ এপ্রণ পরা দুই যুবক স্টেশনের বাইরে ফুটপাতে বসে খবরের কাগজ বিক্রি করছে। গায়ের রঙ দেখে বাংলাদেশী না ভারতীয় বোঝা না গেলেও চেহারায় একটা বাঙালী বাঙালী ভাব দেখতে পাচ্ছি। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই শুনি দু'জন নিজেদের মধ্যে নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছে। আমরা নিজেদের পরিচয় দিতেই একজন বেশ আগ্রহ দেখালো, অন্যজনের চোখে কেমন একটু সন্দেহের দৃষ্টি। বোখারী আমার পেটে গুতো মারলো। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আমরা জাতিসংঘে কাজ করি, কসোভোতে, এখানে বেড়াতে এসেছি। তখন ওরা আমাদের আত্মীয় হয়ে গেল। আমাদের বাসায় না নিয়ে ছাড়বেই না।

খবরটা আমরা আনোয়ারুজ্জামানকে দিলাম। তিনি আমাদের ওপর তেলে বেগুনে রেগে গেলেন। 'খাওন আনতে এতোক্ষণ লাগে?' হট ডগ ততোক্ষণে প্যাকেটের ভেতর ঘুমিয়ে কোল্ড। প্রথমে 'খামুনা' বললেও জামান ভাই গোগ্রাসে কোল্ড ডগ খেয়ে নিলেন। খেয়েই কোক-এর বোতলটার দিকে হাত বাড়ালেন। 'এইবার আপনেরা পাহারা দেন, আমি ঘুইরা আহি'। কিন্তু যখন দেড়ঘন্টা পরেও তিনি ফিরে আসেন না, তখন আমরা খানিকটা ভয় পেয়ে গেলাম। পালা করে খুঁজতে বের হলাম। তিনি লাপাত্তা, তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে, আমরা অস্থির হয়ে উঠি। খুরশিদকে রেখে দ্বিতীয়বারের মতো আমি এবং বোখারী খুঁজতে বের হই। বাইরে কোথাও গিয়ে এক্সিডেন্ট করলো না-তো? এই লোকতো রাস্তা-ঘাট পার হতে পারে না। নাকি দূরে কোথাও গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে? আমরা উৎকণ্ঠিত। এস্কেলেটরে চড়ে ভূ-গর্ভস্থ স্টেশনের নিচে নেমে আসি, ৫০ ফুট নিচে। এখানে একটি ত্রিমোহনা আছে, মানুষ তিনদিকে ছুটছে। সেই মোহনায় বাঙালীদের একটি ছোটখাট জটলা। দেখি জটলার মাঝখানে একটি চেয়ারে বসে আছেন জামান ভাই, তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে কয়েকজন বাঙালী, সকলের পরণে হলুদ এপ্রণ, ওরা সবাই খবরের কাগজ বিক্রেতা। আমাদের

দেখে জামান ভাই বলেন, 'আহেন আহেন, দেখেন অরা সব আমার দেশের পোলাপাইন, বিক্রমপুরের পোলাপাইন।' আমরা তাকিয়ে কোন পোলাপাইন দেখি না, দু'জনের মুখে বড় বড় দাড়িও আছে, মাথায় টুপি। দাড়িঅলা পোলাপাইনেরা জামান ভাইকে পেয়ে উৎসবে মূখর এটা বেশ বুঝতে পারছি।

ট্রেনের সময় হয়ে গেছে, আমরা ফিরে আসি। বিক্রমপুরের পোলাপাইনদের সাথে আমাদের আর গপসপ করা হলো না। জামান ভাইকে মনে হলো কিছুটা টলছেন, ওরা কি তাকে মদ খাওয়ালো নাকি? ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। আমরা বার্লিনের পথে। প্রত্যেকে রাতের পোশাক পরে ঘুমানোর জন্য যার যার বার্থে উঠে গেছি। তিন স্তর বিশিষ্ট বার্থের একদম ওপরের দুটিতে আমি আর জামান ভাই, নিচে খুরশিদ এবং বোখারী, মাঝখানের দুটি খালি। রেলগাড়ি ঝমাঝম টাইপের কোন শব্দ নেই, ইউরোট্রেন ছুটে চলেছে রানওয়েতে ছুটে চলা বিমানের মতো। একেবারে স্মুথ জার্নি। জামান ভাইকে প্রশ্ন করি, 'কি জামান ভাই, বিক্রমপুরের পোলাপাইনরা কিছু খাওয়াইলো?'
'হ, খাওয়াইছে। চা-বিস্কুট খাওয়াইছে। বাসাই নিতে চাইছিলো। সেলমন মাছের ঝোল দিয়া ভাত খাওয়াইবো কৈছিলো, দেহি ফেরার পথে যাইতে পারি।'
'জামান ভাই, আমরাতো আর এই পথে ফিরবো না।'
'ও, ভুইলা গেছিলাম।'
জামান ভাইয়ের কথা জড়িয়ে যায়।
'আপনার কি ঘুম পাচ্ছে?'
'হ, শৈলডা কেমন কাহিল লাগতাছে।'
'ঠিক আছে, ঘুমান।'

ট্রেনের এটেনডেন্ট এসে আমাদের ওয়েকআপ কল দিয়ে যায়। আমরা উঠে বাথরুমে যাই। দাঁত ব্রাশ করি। হাত-মুখ ধুই। জামা-কাপড় পাল্টাই। আর মাত্র কিছুক্ষণ, তারপরই পৃথিবীর অন্যতম এক সমৃদ্ধ শহর বার্লিন। আমরা বার্লিন শহরে পা রাখার আনন্দে উত্তেজিত। আমি বলি, নামার আগে সবাই যার যার টিকেট, পাসপোর্ট আর টাকা-পয়সা ভালো করে দেখে নেন।

জামান ভাই চিৎকার করে ওঠে। 'কি হলো, জামান ভাই?'
'সর্বনাশ হৈছে। আমার সব লৈয়া গেছে।'
জামান ভাই তার সবগুলো জামার পকেট, মানিব্যাগের সবগুলো প্রকোষ্ঠ খুঁজেও, দেড় হাজার ডলার, বেশ কিছু ডয়েশ মার্ক, বাংলাদেশী টাকা, কিছু ট্রাভেলার্স চেক খুঁজে পেলেন না।

লেখক: কবি, জাতিসংঘের পেশাজীবী